OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 176 - 183
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প : পুং-তন্ত্র বিরুদ্ধতায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

কিশোর কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক
দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID: kishoreroy84@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Feminism, patriarchy, self-reliance, women's rights, liberty, severalty, protest, society.

Abstract

Tilottama Majumdar is a renowned writer in Bengali literature in recent times. She is a novelist, short story writer, poet, essayist. However, her main identity and popularity is as the author of the first two literary works. She was born in North Bengal and spent her childhood in the Kalchini tea garden of Alipurduar district of North Bengal. She studied at Union Academy School there. Later, in 1985, she came to Kolkata to study at the undergraduate level at the Scottish Church College. Her writing began in 1993. One of the subjects of her writing is women. Women's characters usually occupy a large part in her writing. Their rights, self-reliance etc. are integrally involved in her writing. Since the beginning of civilization, society has been male-centric. Women are defined by the definition given by men. Their appearance, beauty, intelligence, and rights all are determined by the standards given by men. Times have changed - society has entered the third decade of the 21st century, but the position of women has not changed. Women are still the property of men, and men are the absolute masters of society. Despite various women-centric movements and theoretical discussions to protect women's rights, women's place in society has remained unchanged. The attempt to blunt women's brains with the tricks of saying that women are great, omnipotent, etc. has existed throughout the country. It is in this context that Tilottama Majumdar's women-centric stories have gained status in opposition to patriarchy and in a spirit of protest. In her stories the women try to strike a powerful blow at the patriarchal mentality of society. They are brave, financially strong, and possess modern thinking. This distinction is not imposed on them; they are like the story-writer's own entity. The writer's own mentality towards establishing women's rights seems to be embedded in the characters. And in this way, the stories become a text of a special statement beyond the limits of the story. In the present article, an attempt will be made to recognize the uniqueness of women in the light of some such stories.

Discussion

তিলোত্তমা মজুমদার [১৯৬৬] একালের অন্যতম সাহসী ও শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত বিগত শতকের শেষ পাদে; এবং বলা যায় একবিংশে এসে তার আলোকোজ্জ্বল সম্পূর্ণতা। বিষয় স্বাতন্ত্র্য, ভাষাপ্রয়োগ ও মননের গভীরতা যার চিহ্নায়ক। আনন্দ পাবলিশার্সে সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত তিলোত্তমার সাহিত্য-বিচরণ মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই। তবে কবিতাও তাঁর লেখালেখির অঙ্গ। বর্তমান প্রবন্ধে যদিও তাঁর ছোটগল্পই আলোচ্য। গল্পগুলি 'মানবচরিত্র এবং জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়'মণ্ডিত ও তাঁর স্বাতন্ত্র্যনির্মাণের অন্যতম স্তম্ভ। দেশ-কাল লেখকের মনন-ধৃত হয়ে কলমে উদ্ভাসিত হওয়ার সৌত্রেই গল্পগুলি যেন একালের নারীর যুগযন্ত্রণার অন্যতম প্রতিবিম্বন। নারী ভোগ্য, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, সংসারের অলিখিত দাসী-বাঁদি — আরও অনেকানেক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে দেখবার। কোনটিই মর্যাদাব্যঞ্জক নয় এবং সামাজিক-পারিবারিক এই দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুবত্বেই নারীর অবস্থা অপরিবর্তিত, স্থির। তবে তিলোত্তমার গল্পের নারী চরিত্রগুলির দিকে দৃকপাত করলে তদূর্দ্ধে আরেকটি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করে। তা হল, বহুকালব্যাপী পুংতন্ত্রের যে প্রকাশ্য-প্রচ্ছন্ন নারীশোষণ; তার বিপ্রতীপ একটি বলিষ্ট স্রোতের প্রবাহ। নারী সেখানে মাত্রই পুরুষের কাষ্ঠপুত্তলিকা বা গলগ্রহ নয়; স্বাবলম্বী, আত্মপোষণকারী, সর্বোপরি আত্মমর্যাদাভিলাষের স্বাতন্ত্রে বিশিষ্ট। সেই বিশিষ্টতায় দেখি, বিশ্বায়নের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল জীবনে আধুনিক মানবীর রক্ষণশীল মানসিকতা ও সামাজিক কারাগার অর্গলমুক্ত করে আত্নচেতনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবনাখ্যান রচনার প্রয়াস।

কবি নারী/ মানবীর রূপনির্মাণ করেছিলেন আপন সৌন্দর্যরসের নিষেকে -

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী-
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।
...।
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।"

— এই রোমান্টিক কল্পনা আজ আধুনিক নারীচেতনাবাদ-পাঠে প্রশ্নের সম্মুখীন। শ্রদ্ধেয় তপোধীর ভট্টাচার্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন–

> "...যার তিলোত্তমা মূর্তি গড়ছে পুরুষ, কে সে? সে কী বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নাকি এই 'রচনা' আসলে আত্মরতির প্রয়োজনে! নিজেকে তৃপ্ত করতে চাই বলে ব্যক্তি-নারীর ওপর চাপিয়ে দিই নারীপ্রতিমার মোহিনীমূর্তি? খররৌদ্রের বাস্তবে দেখতে চাই না বলে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিই, স্নিগ্ধতা আর লাবণ্যের অতিরেক তৈরি করি। এতে নারীব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হয় নাকি সুকৌশলে তার কল্পিত অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্য দেখানো হয়, এই খটকা থেকে যায়।"[১]

এই সুকৌশল কল্পনা আসলে পিতৃতান্ত্রিকতারই প্রতিচ্ছায়া। স্থান ও কাল নির্বিশেষে সমাজ পুরুষতান্ত্রিক— এই একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও যা ব্যত্যয়হীন। নারী যুগে যুগে পুরুষের যৌন কামনার ধন, ভোগ্যপণ্য; এবং সমাজনীতির যাঁতাকলে ক্লিষ্ট, পিষ্ট। তার সত্তা আত্ম-বর্জিত। 'নারী' শব্দ তারই ইঙ্গিতবাহী। 'নর'-এর বিপরীত বোঝাতেই যেন তার সৃষ্টি। কিংবা রমণী, স্ত্রী, যোষিৎ, যোষা, অবলা, কামিনী! — সেখানেও রয়েছে পুরুষেরই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবেশ; রয়েছে নারীর অবমাননা। নারী যেন মানবজাতির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, নর-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অন্বিত হয়েই তার স্থিতি। বলাবাহুল্য, সে স্থিতি গৌরবময় নয়। কারণ পিতৃতান্ত্রিকতা আপন স্বার্থেই নারীমননে করেছে নানা কূট-কৌশলের আরোপন। কখনো তার দেহজ লাবণ্য-সৌন্দর্যের গুণগানে, কখনো বা 'নারীত্বের অপার মাহাত্ম্য'- ধারণার মধ্য দিয়ে তাকে আবেগচালিত করে। যুগব্যাপী এই আরোপিত ধারণার সফল প্রয়োগে নারী মানসিকতাও নিয়েছে এমন আকার, যেখানে পিতৃতন্ত্রের কৌশল নারী-মনোলোকে সৃষ্টি করে 'নারীত্বের' স্বপ্নিল আবেশ ও মহত্ত্বতা। অথচ নারী বাল্যে-কৈশোরে পিতার, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে পুত্রাধীন। পুরুষের সেবা ও অধীনতাই নারীজীবনের একমাত্র কৃত্য! আশ্চর্যের বিষয়, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও এসবের চর্চা ছিল; দেখছি এযুগেও। নারী চেতনাবাদের হাত ধরে পুরুষ ও নারীর সমতাবিধানের নানান তাত্ত্বিক

ভাবনায় নারীর সামাজিক স্থান, তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষের পিপাসা নিবৃত্তির উপকরণ বা নারীকে সংসার গৃহকোণে আগলাবার মাধ্যম হিসেবে দেখবার স্বাভাবিক চিন্তাচেতনায় আপাত পরিবর্তন লক্ষিত হলেও; অন্তঃসলিলার মত সমাজ-মানসিকতায় পুরুষতন্ত্র আজও নিরঙ্কুশ। তিলোত্তমা মজুমদারের নারীকেন্দ্রিক গল্পগুলি এই তথ্যের সাহিত্যিক দলিল। সেখানে স্পষ্টভাবে দেখি, তুলনামূলক কমশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কর্মজীবিনী- প্রত্যেকেই পীড়িতা। পুরুষতন্ত্রের কূটকৌশলে নারীর আত্মযন্ত্রণা, মানসিক ও শারীরিক পীড়নের বহুবিধ ছবি। সমাজ মানসিকতার কাঠামোয় সেখানে অস্বীকৃতই থেকে যায় নারীর কর্মনৈপুণ্য ও বৌদ্ধিক গুণবত্তা। তবে এই দৃশ্যের বিপ্রতীপে তিলোত্তমার গল্পের নারী চরিত্রগুলির বিশেষত্ব, তারা যুগ যুগ ব্যাপ্ত সামাজিক নিয়মের শিকার, পীড়িতা; কিন্তু তাতেই ক্ষান্তি দেয়না। প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো এবং অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণপণ প্রয়াসী। আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তিত মানসিকতায় তারা এতকালের অব্যক্ততা কাটিয়ে অন্তরাত্মা উন্মোচনে সাহসী এবং সোচ্চার। গল্পের নারী চরিত্রগুলি যেন সমগ্র নারীজাতিরই প্রতিনিধি হয়ে সোচ্চার উচ্চারণে আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেঃ ‘নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।/ পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি।/ হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।’ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিচিত্রধর্মী নারী-শোষণের বিপরীতে এই রণহুঙ্কারেরই এক একটি খতিয়ান তিলোত্তমা মজুমদারের ‘ননদ-বউদির রান্নাঘর’, ‘জ্যোতির্লীনা’, ‘ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা’, ‘মায়া’, ‘একটি গুপ্তহত্যার ইতিবৃত্ত’, ‘মণিকুন্তলা’, ‘ছবি’, ‘স্তনী’ ‘অ আ ক খ’, ‘আম্লান’, ‘গর্ভপাতকিনী’, ‘শর’, ‘নীল’ ইত্যাদি গল্পগুলি। সবগুলি আলোচনার বিস্তৃত পরিসর এখানে অপ্রতুল। দরকারও নেই। আমরা শুধু প্রথমোক্ত কয়েকটির মাধ্যমেই লেখকের মানস প্রবণতা ও সমাজ-চেহারা অন্বেষণে প্রয়াসী হব।

‘ননদ-বউদির রান্নাঘর’ গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা দুই নারীর স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার যে প্রয়াস তা সমাজনীতি ও রীতির বিপরীত স্রোতবাহী। বাস্তবের কঠিন কঠোর ভূমি থেকে সাহিত্যের পাতায় উঠে আসা নারীর জীবনযুদ্ধ লড়াইয়ের কাহিনি দুর্লভ নয়, কিন্তু এ গল্পে দুই পরিবার-ছিন্ন মহিলা, সম্পর্কে ননন-বউদি; পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে পুং-শাসিত সমাজে পুরুষনির্ভরতা কাটিয়ে উঠে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে, পুরুষের সঙ্গে সহবাস না করেও স্বাধীন জীবনযাপন করে দেখিয়েছে। কাকলির বর ‘কাজ খুঁজতে যাচ্ছি’ বলে বোম্বাই গিয়ে বহুবছর ‘নিপাত্তা’। আর ‘মিনতিকে বর নেয়না।’ যূথবদ্ধতায় সূচনা হয় বউদি-ননদের নূতন সংসারের। গ্রিল কারখানার পেছনে এক চিলতে জমিতে ঘর; ভাড়া ছ’শো টাকা। পার্টির লোকাল কমিটির সহায়তায় এবং বুদ্ধিতে শুরু হয় রান্নার হোম ডেলিভারির কাজ। মিনিতির বয়স কম- কাজের ফাঁকে সময় বের করে সে পাড়ার শেষ প্রান্তে অভয়নাথের চায়ের দোকানে যায়। চা খায়, পরনিন্দা করে আধবুড়ো অভয়নাথের সঙ্গে। কাকলির তা পছন্দ নয়। মিনতির অনুপস্থিতি এবং ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে খাবার পৌঁছে দেওয়ার তাড়না তাকে ক্ষুব্ধ করে - “ভাল জৌর শুরু করেছে সকাল থেকে। কোথায় এসে কুটবে তা না। ঢলাচ্ছে।” মিনতি তখন ফিরতে ফিরতে তৃষ্ণার্ত মনে নিজের সম্পর্কে ভাবে- ‘না হয় তার দাঁত একটা বড়। গায়ের রঙ কালো। তা সেই সোঁদরবনের গায়ে বড় হয়েছে। সেখানে কে কবে ফিট-ফরসা হয়। এ ছাড়া আর সব অন্য মেয়েমানুষের মতই তো! তা হলে নিল না কেন? বেশ একটা নিজের সংসার হত।’ মানসিক কাঠিন্যে পুং-তন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করার সাহস যোগালেও সংসার যাপনের চিরন্তন বুভুক্ষা ও সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়না। তবু পরমুহূর্তেই সাজতে ভালোবাসা মিনতি ভেবেছে- ‘জন্য এত সাজ? কার জন্য আবার? আমার নিজের জন্য। বর নেয়নি বলে সাজতে নেই নাকি?’ ননদ-বউদি অশ্লীল ঝগড়ার শেষে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে একে অপরের সহায়ও হয়ে উঠেছে এই গল্পেই। মিনতির মনোলোকের গহীন ভাবনায় তা স্পষ্ট হয়েছে - ‘কী বিষ কী বিষ। ঝগড়া করলে নেমে যায়। কিন্তু ঝগড়াটা শুধু কাকলির সঙ্গেই ভাল আগে কেন?’ ভাল লাগে; সমবেদনা ও পারস্পরিক অবলম্বন হিসেবে আর্ত অসহায় দু’জনের মানসিক নৈকট্যের কারণে। তারা জানে, পুরুষসর্বস্ব সমাজে নারীর প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার কথা— জানে, লৈঙ্গিক তৌলে সমাজে তাদের স্থান নির্ণীত হওয়ার কথা। নারী শুধু ভোগ্যপণ্যই নয়, সংসারে পুরুষের যাবতীয় চাহিদা পূরণের উপকরণ। নারীর লৈঙ্গিক অবয়ব, দৈহিক সৌন্দর্যই তার মূল্য নির্ধারক। স্মর্তব্য, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধে কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিমের উক্তি - ‘...তার পরে মালা— এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা— কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়।’

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কমলাকান্তের মতকে বঙ্কিমের মত ব'লেই ধরতে পারি, এতে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র পুংতান্ত্রিক মনোভাব।"[২]

নারীর এই অবমাননা ও পুংতান্ত্রিক উগ্রতা অন্তঃসলিলার মত বহমান একবিংশ শতকের আধুনিক সমাজ মানসিকতায়। কাকলি-মিনতির উৎকট অশ্লীল ঝগড়া তাই তাদের শ্রেণিগত অবস্থান ও জীবনযুদ্ধের বিচারে গৌণ; বরং পুং-তন্ত্রের প্রথা ভেঙে সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করার প্রচেষ্টার অভেদতায় নৈকট্যেরই প্রকাশক। আবার, গল্পের পরিণতিতে মিনতি জেনেছে কাকলির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ; কাকলি মিনতির স্বামীর। দু'জনেরই সে সংবাদ একে অপরের কাছে গোপন করার প্রয়াসে রয়েছে সহানুভূতি, সমবেদনা তদুপরি নারীর অন্তরাত্মার রক্তক্ষরণের সাযুজ্য। মিনতি ও কাকলির অনুভবে তা ধরা পড়ে -

> (১) "দাদার জন্য কাঁদলাম? নাকি অন্য কারণে? আগে অনেক কেঁদেছি ওর জন্য। আর জল ছিল না। এক-এক জন মানুষের জন্য এক-এক পরিমাণ জল। দাদার জন্য আর জল নেই। দাদা আবার বিয়ে করেছিল! ওই জন্যি ঘরে আসত নাকো। কেন? বউদির কী নেই? আর পাঁচটা মেয়ে মানুষের চেয়ে কম কীসে? দাঁত উঁচু নয়। দাদা মরেচে। আগেই কী মরেনি।"
>
> (২) "এ সংসারে বলরাম আগেই মরেচে। মিনুটার কী জীবন! আহা! সাজতে-গুজতে কত ভালবাসে। এবার একটা গয়না গড়িয়ে দেব। ধারটা শুধি। অভয়নাথের সঙ্গে মিনুর ভাব আচে। আচে ত আচে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে। অন্তত শরীলের জন্যও ত একটা বেটাছেলে লাগে।"

-স্নেহ, সহানুভূতি মিশ্রিত একটা justification-এ সামাজিক নিয়ম ও পুং-তন্ত্র পীড়িতা নারীর লড়াইকে প্রশ্রয়পূর্ণ ভালবাসায় আর্দ্রতাযুক্ত করেছেন গল্পলেখক। তবে গল্পের শেষে লেখকের চমক— পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধতায় তীব্র প্রতিবাদে কাকলি-মিনতির প্রথাভাঙা আচরণে। তার অনুল্লেখে এ গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লক্ষণীয় স্বামীর মৃত্যসংবাদ প্রাপ্ত দুই নারীর রাত্রিকালীন আহার্যের সম্ভার। দু'জনের কথোপকথন -

> "তোর কই?"
> "আমি কাতলা খাব। হবে তো আবার।
> "একটু চিকেন খানা। আচে না? অত রাঁধিস। ভাল খা।"

সদ্য স্বামীহারার যুগকালব্যাপী দেশজ সংস্কার পালনের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তাদের বৈপ্লবিক জীবনচর্যা-রূপ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে।

> "পিতৃতন্ত্র নারীর জন্যে যে-পেশাটি রেখেছে, তা বিয়ে ও সংসার; এ-ই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত নারীর নিয়তি। এরই মাধ্যমে নারীকে বিস্তৃত জীবন থেকে সংকুচিত ক'রে, তার মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলে, তাকে পরিণত করা হয় সম্ভাবনাশূন্য অবিকশিত প্রাণীতে। নারীকে দেয়া হয়েছে বিয়ে নামের অনিবার্য স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যার মধ্য দিয়ে সে ঢোকে একটি পুরুষের সংসার বা পরিবারে; পালন করে পুরুষটির গৃহিণীর ভূমিকা, কিন্তু বন্দী থাকে দাসীত্বে। প্রথাগত স্ত্রীর ভূমিকা একটি প্রশংসিত পরিচারিকার ভূমিকা, যে তার প্রভুর সংসার দেখাশোনার সাথে কাম ও উত্তরাধিকার দিয়ে চরিতার্থ করে প্রভুর জীবন।"[৩]

নারীর জীবনকে ছেঁটে ফেলে, তার সম্ভাবনাকে পিষ্ট করা আস্ফালিত পৌরুষের কদর্য উদাহরণ চতুর্পার্শ্বে। তবু 'জ্যোতির্লীনা' গল্পে দেখি নারীর স্বপ্নবুনন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রাণপণ প্রয়াস ও সাহসী পদক্ষেপ। কমলজ্যোতি ও আকাশলীনা— দুই সহপাঠিনীর স্বপ্নডানায় ভর করে সামাজিক-পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে আপন আপন ইচ্ছেপূরণে পাড়ি দেওয়ার গল্প। নৃত্যকলা ও অঙ্কনে দুই প্রতিভা তারা। তবে আকাশলীনার কথায় বাস্তবসত্য ধরা পড়ে- 'ছোটবেলায় সবাই শেখে, নাচ, গান, ছবি আঁকা, টেবিল টেনিস, দৌড়, সাঁতার, যোগাসন- তারপর যেই বিয়ে হবে, সব শেষ। বাচ্চা হল ত আরও গেল।' নারী জীবনের সীমাবদ্ধতা গল্পসূচনাতেই লীনার কথায় স্পষ্ট হলেও কাহিনির গতিমুখ আরও প্রসারিত হয়েছে বক্তব্য বিষয়ের গভীরতায়। সেখানে রয়েছে বেপরোয়া লীনার সামাজিক নিয়মের ছকভাঙা সাহসী পদক্ষেপ। দেখি তার প্রেম প্রেম খেলা।

আর পরিচয় পাই প্রেমিক নীলাঞ্জনের কাপুরুষোচিত এবং matriarchy সুবোধ বালকসুলভ মানসিকতার। জ্যোতিকে লেখা লীনার চিঠিতে তার উল্লেখ রয়েছে - 'আমি নাকি দুশ্চরিত্র। নীলাঞ্জনের তো বাবা নেই। ও বলে, তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু মাকে দুঃখ দিয়ে বিয়ে করতে পারব না।' লীনা বিয়ে করে বসে অসভ্য, অভব্য 'মাঝারি উচ্চতার, কালো, খয়াটে চেহারার' অলককে। আসলে এও তার নির্বিকার বেপরোয়া প্রতিবাদ। অন্যদিকে নৃত্যকলায় উচ্চশিক্ষালাভে জ্যোতির কলকাতায় পাড়ি দেওয়া; স্বপ্নপূরণে ঘটিবাটি বিক্রির বাজি—সেখানেও রয়েছে বৈপ্লবিক মানসিকতা। আবার জ্যোতির বিয়ের পর উন্মোচিত হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লুকোনো প্রাচীন মানসিকতা - মায়ের পছন্দ নয় বলে বরের তাকে নাচের বদলে গান শিখতে বলায়। জ্যোতি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে - 'কিছু ভুল আছে তোমার ভাবনায়। তার সংশোধন প্রয়োজন। আমার বাবা-মা সর্বস্ব বিক্রি করে জলপাইগুড়ি শহর ছেড়ে কলকাতায় দীন-হীনের মত থেকেছেন, যাতে আমি গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে পারি। তোমার কি মনে হয়, এ আমার একটা কিছু নিয়ে থাকা? গান আমি গাইতে পারি না। গাইতে চাই-ও না। যদি চাইতামও, আমার শিক্ষক আমি নিজে নির্বাচন করতাম। এটা কি অষ্টাদশ শতাব্দী, যে চিকের আড়ালে বসিয়ে তুমি আমাকে মহিলা টিচারের কাছে গান শেখাবে?' অষ্টাদশ শতাব্দী নয়; তবু জ্যোতির অনড় অবস্থানে বরের পিতৃতান্ত্রিক অহং ধাক্কা খেলে জ্যোতির থেকে মুখ ফিরিয়েছে। জ্যোতি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসে গুরুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিয়ে করে আপন মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে স্বপ্নের বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে। এই গল্পেই জ্যোতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময় চারিত্রিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে নারীসুলভ স্বাভাবিকতায় সংসার রক্ষার্থে ত্রুটিহীন চেষ্টাও দেখি। নাচের জগতে ফিরে যেতে স্বামীর কাছে কাকুতি-মিনতি বা স্বামী-সংসার-সন্তান সমস্ত কিছুকে ছন্দে বেঁধে রাখার, গৃহকে শান্তির আশ্রয়ে বন্ধনীকৃত করার শপথ, তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বরের পুরুষতান্ত্রিক অহমিকা স্ত্রীর মন ও স্বপ্নকে অস্বীকার করলে সে নিজ পছন্দ-অপছন্দ, স্বপ্নের অস্বীকৃতির উপলব্ধিতে সাংসারিক সমস্ত অর্গল স্খলন করেছে। অসম্মানিত দাম্পত্যের বেদনায় নারীসুলভ নীরব অশ্রুমোচন বা স্বপ্নের সঙ্গে আপোষ নয়; আপন স্বপ্নের স্বীকৃতি প্রয়াসেই 'জ্যোতি' প্রজ্বলিত হয়েছে।

নারীত্বের অবমাননা ও প্রতিবাদে উচ্চকিত দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাই 'ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা' গল্পেও।

> "বিয়ের জন্যে দরকার পুরুষ ও নারী দুজনকে; তবে বিয়েতে তাদের ভূমিকা সমান নয়; পুরুষ বিয়ে করে, নারী বিয়ে বসে, নারীকে বিয়ে দেয়া হয়, নারীর বিয়ে হয়...। প্রতিটি পিতৃতন্ত্র বিয়ের যে-বিধান করেছে, তা সম্পূর্ণ পুরুষের স্বার্থে প্রস্তুত। নারীর স্বার্থ তাতে দেখা হয়নি; নারীকে ব্যক্তি হিশেবেই গণ্য করা হয়নি।"[৪]

এই অনিবার্যতাতেই চোখে পড়ে সমাজ নামক পুরুষ-কারাগারে বিবাহের কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ নারীর ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ও তাকে নিপীড়নের ছবি। আলোচ্য গল্পেও বিবাহ-উত্তর নারীর দাম্পত্য সমস্যার চিত্রাঙ্কনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই নগ্নতা প্রকট। জৈবিক নিয়মের স্বাভাবিকত্বে মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত, অথচ বর নিজ দৈহিক লালসা-নিবৃত্তির তাড়নায় কুণ্ঠাহীন নির্মম ভ্রূণহত্যার সঙ্গে নারী-আত্মাকেও হনন করেছে। চেঁছে চেঁছে বের করা হয় 'সন্তানের রক্ত মাংস ডেলা ডেলা'; নারীর তখন একমাত্র কাম্য হয় নিজের মৃত্যু! 'হোক হোক হোক, তার মৃত্যু হোক।' প্রৌঢ় ডাক্তারের কণ্ঠে উচ্চারিত সান্ত্বনাবাণীঃ 'কিছু হয়নি রে মা। এতে কোনও ক্ষতি নেই।' তাও আসলে প্রচ্ছন্ন পুরুষতন্ত্রেরই নির্বিকার উচ্চারণ; যা লাভ-ক্ষতির বাহ্যিক হিসেবে মাতৃত্বের অমোচনীয় অপূরণীয় ক্ষতি পরিমাপে অক্ষম। সেই পরিমাপে পীড়িতার 'ক্ষতি' ও ক্ষতের গভীরতা নগণ্য। থানার বড়বাবুর কাছেও অভিযোগ গুরুত্ব পায় পীড়িতার পিতার পেশাগত পরিচয়, তার নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আত্ম প্রতিপালনের সামর্থ্য-অসামর্থ্যের তৌলে! অতএব পুং-তন্ত্রের মাণদণ্ডে ডাক্তারেরই সুরে বড়বাবুরও পরামর্শ 'কিছু হয় না। ওতে কিছু হয় না। মারধর করে না যখন মানিয়ে নিন।' মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শে রয়েছে পুরুষতন্ত্রেরই সুচতুর কূটকৌশল, পুরুষতন্ত্রেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য! এই প্রোথিত নারী-আদর্শের ধারণায় নারী সেখানে সহনশীলতাকে মহৎ অনুভব করে! তবে পরাজয় নয়; প্রতিবাদে সংসার-শৃঙ্খল মোচন করে শেষে নারীত্বের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে। শ্বশুরগৃহ নামক সমাজস্বীকৃত নিশ্চিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে মশলাওয়ালা পিনাকীর হাত ধরেছে; তার সংসারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নেই, ফাঁক-ফোকর অনেক, কিন্তু সেখানে সে 'অন্য ধনে ধনী'। আগে 'দাসী-বাঁদির মত দিন কাটত'; পিনাকীর সংসারে সে রাজরানি!

অতঃপর শ্বশুরগৃহের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার-পীড়নের প্রতিবাদে মুখরা হয়েছে- ‘কত কষ্ট দিয়েছেন আমাকে। মুখযন্ত্রণা, বাপের অবস্থা তুলে খোঁটা, মুখে রক্ত তুলে খাটিয়েছেন। আপনাদের ঘেন্না করি আমি। বেশ করেছি চলে এসেছি। কীরকম মুখ পুড়িয়ে দিলাম আপনাদের। ...মুখে চুনকালি পড়ল তো। আপনার ছেলেকে দেখিয়ে এখন লোকে বলবে- ওর বউ একটা মশলাওয়ালার সঙ্গে পালিয়েছে।’ ‘পুরুষের স্বার্থসর্বস্ব’ বিয়ে নামক সামাজিকতার যূপকাষ্ঠে শরীর ও মন গলিয়ে নয়; পিনাকীর ‘মনের বিয়েই আসল’ বিশ্বাসে ভর করে তার হাত ধরার মধ্যে রয়েছে হৃদয়ধর্মের প্রাধান্য, একই সঙ্গে নারীত্বের আরোপিত মাহাত্ম্যের শৃঙ্খল মোচন ও প্রতিবাদ। তাতেই এ গল্পের স্বীকৃতি।

নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, বংশ রক্ষার আধান; তবে বংশ রক্ষার গৌরবে অন্বিত হওয়ার শর্ত বিবিধ - ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’- পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া যে শর্তগুলোর অন্যতম। যুগ যুগ লালিত এই কামনায় রয়েছে পুরুষকে গরিষ্ঠতা দানের প্রচ্ছন্ন মানসিকতা; নারীত্বের প্রতি অবমাননা ও তার মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থাহীনতা। মজ্জাগত এই পুত্রলাভের বাসনা একবিংশ শতকেও শিক্ষিত অর্থবান অভিজাত সমাজে নগ্নভাবে প্রকট ও প্রবহমান, তারই নিদর্শন দেখতে পাই ‘মায়া’ গল্পে। বড়লোক ঘরের পুত্রবধূ আসন্নপ্রসবা সোনালি ও সেবাসদনের আয়া মায়া দু’জনই তাদের সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে সন্তানকেন্দ্রিক স্ব স্ব মানসিকতাকে মির্দেশ করেছে। সোনালি তার শাশুড়ির চাহিদা পূরণে ‘ছেলে হবে’ এই স্বপ্নকে লালিত করে শেষে কন্যাসন্তান প্রসব করায় পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। সন্তানকে স্তন্যদানে অনিচ্ছুক সোনালিও বলেছে- ‘আমি চাই না ও বাঁচুক। আমি মেয়ে চাই না।’ মাতৃত্বের এই অপমান বধূর মানসিকতায় আসলে প্রোথিত। যার মূলে রয়েছে সমাজ-নির্দিষ্ট কতগুলি সূত্র- সংস্কারের অর্গল। সোনালিকে তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর যে সান্ত্বনা, তাতেও রয়েছে সেই সূত্রেরই প্রচ্ছায়া - ‘যোগ প্রক্রিয়ায় আছে জানো?’... ‘নির্দিষ্ট লগ্ন ও পদ্ধতি মেনে সঙ্গম করলে ছেলে হয়’। অথচ, স্বামী হারা মাধ্যমিক পাস মায়া তুলনামূলক কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে একই সময়ে ভাবে- ‘বংশরক্ষা ছেলে মেয়ে দুই মাধ্যমেই হয়। অষ্টম-নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বই পড়লেই তা জানা যায়। সোনালি কলেজে পড়া মেয়ে। দীপক ইঞ্জিনিয়ার। তারাও জানে। মায়ার চেয়ে বেশি জানে। কিন্তু মানে না। বিজ্ঞানের চেয়ে সংস্কার মানা অনেক সহজ।’ মায়ার চোখে তাই সোনালির শ্বশুরবাড়ির প্রাসাদোপম বাড়ি ‘পুরনো’- রক্ষণশীল। বড় বাড়ি, কিন্তু কার্নিশে বট-অশ্বত্থ শেকড় চারিয়েছে। ‘মূল্যবান আসবাবে ভরা ঘর। পরিচ্ছন্ন। সাজানো।’ অথচ নাকে এসে ঠেকে ‘প্রাচীনত্বের গন্ধ’। প্রাচীনত্ব আসলে গোঁড়ামি। ‘পরিচ্ছন্ন’, ‘সাজানো’- আধুনিকতার অন্তরালে সমাজের আদিমতা। গল্পকার যদিও নিরাশ নন। এই আদিমতার বিপরীতে দুই কন্যাসন্তানকে ‘মানুষ’ করার প্রচেষ্টায় আত্মবিশ্বাসী মায়ার লড়াইয়ে সেই আশাবাদ ধ্বনিত। বড় বাড়ি থেকে বেরিয়েই তার মনে পড়ে যায় - ‘বড় মেয়েটা ঝোলা দুল পরতে ভালোবাসে। কিনবে একজোড়া...। ছোট মেয়ের জন্য নেলপালিশ আর দুটি খাতা। সকালেই বলেছিল, খাতা লাগবে।’ সংস্কারের অর্গলমুক্তি ও শিক্ষার সোপান হয়ে ওঠে নারীচেতনার সমার্থক।

নারীর সার্বিক উন্নতিকল্পে বেগম রোকেয়া বলেছেন –

> “কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত - সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা যে গোলামজাতি নই, এইকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমক্ষতালাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।”[৫]

সময়ের হিসেবে যুগ পাল্টেছে, একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক সভ্যতা পদার্পণ করেছে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান্তর ঘটেনি; তা মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতাতেই স্থির। নারী চেতনাবাদ, নবযুগীয় শিক্ষার পাঠ, বিশ্বায়নের আধুনিক হাওয়ার পরশ সত্ত্বেও যুগব্যাপী সংস্কার নারীকে যেন পরিবারে পুরুষের ইচ্ছাধীন পুতুল করেই রেখেছে। নারী জীবনের সার্থকতা নির্দিষ্ট সর্বদা তার মনিবের আজ্ঞাদেশ পালনে। সমাজ কেবল জানে ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’; অথচ ‘গুণবান পতি যদি থাকে তার সনে’ বেমালুম ভুলে যায়। নারী টিকে থাকে তার স্বপ্ন অথবা নিপীড়ন-নির্যাতন-অবহেলা-প্রভুত্বের সঙ্গে সমঝোতা করে। এই প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়ার উপরোক্ত প্রশ্ন ও উত্তরণের প্রায়োগিক রূপ নিবন্ধে আলোচিত গল্পগুলি। স্বনির্ভরতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদে যুগ যুগ লালিত সামাজিকতার শৃঙ্খল মোচনের মধ্য দিয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে প্রত্যেকটি নারী চরিত্র তাই সেই পুরাতন প্রশ্ন - 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?'-কেই নতুন করে উস্কে দেয়। তিলোত্তমা বলেছেন –

> "একজন নারীর স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠার পথ অমসৃণ পাথরের। কণ্টকময়। তার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য যেমন, তেমনি সম্পর্কগুলি সংজ্ঞায়িত ও মর্যাদাব্যঞ্জক করে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নারী তার লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। একজন পেশাদার মহিলার সম্পর্ক শুধু সমাজ-নির্ণীত প্রাচীন সম্পর্কগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবনে পুরুষ সহকর্মী আছে, বন্ধু আছে, পেশাগত যোগাযোগ আছে, সহযাত্রী আছে, দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য যোগাযোগ আছে। সেই সবই একজন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের। এই ক্ষেত্রটি সহজে তৈরি হয় না!"[৬]

গল্পের নারী চরিত্রগুলি স্বোপার্জিত প্রয়াসে সেই ক্ষেত্র নির্মাণের লক্ষ্যে দৃঢ়। সামাজিক স্বাধীনতা বা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যে যে সামাজিক সম্পর্কে পুরুষের সঙ্গে তারা সূত্রবদ্ধ, সেগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ তাদের লক্ষ্য। ছলনায় নারীর স্বাতন্ত্র্য বা সত্তাকে নেতিবাচকতায় আবরিত করা বা তাকে 'মহীয়সী', 'সর্বং-সহা' ইত্যাদির মিথ্যা-ভূষণে বিশেষায়িত করে তার চেতনাকে অ-তীক্ষ্ণ করায় পুং-তন্ত্র সিদ্ধ। তবে নারীর প্রতিটি পদক্ষেপকে শৃঙ্খলিত করার বা তার প্রতি অ-মর্যাদাব্যঞ্জক দৃষ্টির যে প্রক্ষেপণ বা পুং-তন্ত্র সৃষ্ট যুগবাহিত নারীর যে চর্যা, তাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও নারীকে 'নর' থেকে অ-সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে, 'মানুষ'-সত্তায় তাকে সংজ্ঞায়িত করতেই তিলোত্তমার নারীরা সোচ্চার। নিজেকে শৃঙ্খল-ছিন্ন করার এই পথ অ-সুগম, অ-মসৃণ, কিন্তু 'কণ্টকময়'তাকে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে তারা সাহসী।

লক্ষণীয়, স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর অদম্যতা ও অনমনীয়তা- তিলোত্তমার বহু গল্পের প্রধান শর্ত ও সাযুজ্য। ভাষা ও বিষয়ের বৈচিত্র্যও গল্পগুলির বিশেষ সম্পদ। তবে স্বীকার্য, বিভিন্ন গল্পের নারী চরিত্রগুলি কখনও কখনও তাদের পুনঃপুনিক প্রতিবাদী ক্রিয়ায় গল্পকে একই খাতে প্রবাহিত করার অনুভব করায়। গল্পগুলি স্রষ্টার মনন ও সৃষ্টি কৌশলের মাপকাঠিতেই এ প্রসঙ্গে বিচার্য। গল্প, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল গল্পই নয়; চরিত্রের যে ক্রিয়া, তাতে রয়েছে গল্পকারের আ-প্রাণ বিশ্বাস। তাই গল্পের সীমা ছাড়িয়ে অনেকাংশে সেগুলি হয়ে ওঠে 'বক্তব্য'। স্মর্তব্য তিলোত্তমার উক্তিটি–

> "আমার বিশ্বাস, নারী সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। আমি এই জায়গা থেকে সব কিছু শুরু করতে পছন্দ করি বা চাই। তার কারণ হচ্ছে যে, আমি যদি এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে না রাখি যে আমি স্বাধীন, তাহলে আমি আমার চারপাশের যে শৃঙ্গখলগুলো রয়েছে যা আমাকে দৈনন্দিনভাবে অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম যেতে হচ্ছে সেটা আমি পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস প্রতিহত হবে। সবার আগে সেই জন্য প্রয়োজন এইটা বিশ্বাস করা যে আমি একজন স্বাধীন মানুষ।"[৭]

নারী-স্বাধীনতা, সচেতনতা বা আত্মনির্ভরতা বিষয়ক একবিংশ শতকীয় যে আন্দোলন বা আলোড়ন, লেখক তিলোত্তমা আসলে সেগুলিকে যাপন করেন তাঁর লেখার মধ্যে। তাঁর গল্পের নারীরা তাই অবিরাম পৌনঃপুনিকতায় লেখার পাতার তাত্ত্বিক গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তবের পুং-তন্ত্র শাসিত কঠিন জমিতে প্রায়শই যোদ্ধৃবেশে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। নারী মাত্রই পুরুষের ইচ্ছা ও আয়ত্তাধীন; অথবা মহত্ত্বতায় নারীত্বের সার্থকতা— যুগলালিত পুরুষতন্ত্রের এই সুকৌশলী ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করার সাহসী পদক্ষেপে গল্পের নারী চরিত্রগুলি নিবিষ্ট। গল্পের পাতা থেকে উঠে এসে কাকলি-মিনতি, কমলজ্যোতি-আকাশলীনারা নারীকে পুরুষের থেকে স্বতন্ত্র করে একবিংশ শতকের সাহসিকতায় ভর করে হয়ে ওঠে বাস্তবনিষ্ঠ। নারীর অধিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠা কেন্দ্রিক এই কাহিনিগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি হয়ে ওঠে বহু নারীর প্রেরণার রসদ। গল্পের চরিত্রগুলির যে সঞ্চরণ, তা নিহিতার্থে গল্পকারেরই আন্তরিক বিশ্বাস।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬, পৃ. ১০৪

২. আজাদ, হুমায়ুন, নারী; আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৩৩৩

৩. তদেব; পৃ. ২৩৩

৪. তদেব; পৃ. ২৩৪

৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, স্ত্রী জাতির অবনতি; মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ২০

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন; ৭ই মার্চ, ২০১৮, ২০:৪৯
লিংক - https://www.anandabazar.com/amp/society/international-society-s-day-some-realisations-of-writer-tilottama-majumdar-dgtl-1.767187

৭. YouTube Link : https://youtu.be/Mn3c4_fUeTE?si=aFP0hH_pu0xP59xx